তিতাস একটি নদীর নাম

তিতাস একটি নদীর নাম

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

ভূমিকা ও সম্পাদনা

ড. শামস্‌ আল্‌দীন

সহকারী অধ্যাপক

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

শব্দাঙ্গন

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৫

তিতাস একটি নদীর নাম

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

© প্রকাশক

প্রচ্ছদ : সোহেল আনাম

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN : 978-984-687-005-3

শব্দাঙ্গন-এর পক্ষে ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০,
ফোন : ২২৬৬৩৭৯০৫ থেকে ইতিয়া আমিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল কাদের প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত। বর্ণ বিন্যাস- শব্দশৈলী কম্পিউটার।

একমাত্র পরিবেশক : শব্দশৈলী, ৩৮/৪ মান্নান মার্কেট, ৩য় তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭১২২৫৪৯৯৭

Titash ekti nadir naam
By
Adwaita Mallabarman

Published by Eitiya Amin
Shobdanggon, 38/4, Banglabazar Dhaka-1100
অনলাইলে পেতে : www.facebook.com/shobdoshoily
অথবা ফোন করুন: 16297

মূল্য : ৪০০ টাকা
$: 10

ভূমিকা

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) মাত্র সাইত্রিশ বছরের জীবৎকালে বিশ শতকের সময়কালে আমরা তাকে কথাসাহিত্যিক হিসাবেই জানি। তিনি আজও তাঁর নামের প্রতি সুবিচার করে চলেছেন। মানুষের জীবনের কর্মই আসল ধর্ম। সেই আলোকে তিনি পূর্ণতা পেয়েছেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু শাখাতে বিচরণ করেছেন। যদিও আমরা তাঁর প্রতিষ্ঠার পিছনে 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসকে ভেবে থাকি। অদ্বৈত মল্লবর্মণের চারটি ছোটগল্প আছে। গল্পগুলো হলো 'সন্তানিকা' (১৩৪৫), 'কান্না' (১৯৯৬), 'বন্দী বিহঙ্গ' (১৩৫২) এবং 'স্পর্শদোষ' (১৩৭৪)। তাঁর ছয়টি কবিতাও রয়েছে। সেগুলো হলো- 'বিদেশি নায়িকা', 'শুশুক', 'যোহার গান', 'ধারা শ্রাবণ', 'মোদের রাজা মোদের বাণী' এবং 'ত্রিপুরালক্ষী', তাঁর রচিত উপন্যাস 'লাস্ট ফর লাইফ' এর অনুবাদ 'জীবন-তৃষা'। প্রতিবেদনধর্মী রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- 'ভারতের চিঠি- পার্লবাক্‌কে' (১৯৪৩)। এছাড়া তাঁর রচনাবলিতে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও আলোচনা শিরোনাম ২৪টি প্রবন্ধও রয়েছে।

নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা জানি। তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) প্রকাশিত হয়। এগারো বছর পরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাকের উপকথা' (১৩৫৪) প্রকাশিত হয়। তারপর সমরেশ বসু লিখলেন 'গঙ্গা', (১৯৫৫)। এই সময়ের শেষ উপন্যাস অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নামে'র (১৯৫৬) প্রকাশ ঘটলো। এই চারটি উপন্যাসই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বাংলা সাহিত্যের আঞ্চলিক উপন্যাস সাহিত্যে এই উপন্যাসটি যুগান্ত সৃষ্টিকারী সংযোজন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি মূলত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস-তীরবর্তী অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জীবন কথা, অঞ্চলকেন্দ্রিক মানুষের জীবনের জয়-পরাজয়, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-বেদনা সবই এই উপন্যাসে প্রতীয়মান হয়েছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের শিরোনামহীন ভূমিকায় যেন সে কথাই বলা হয়েছে'... আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করিবার চিত্রকর্মই আছে। পরিচয়ের অভাবে লেখক অনেক স্থানেই মিথ্যা রোমান্টিক, আবার অনেক স্থানে সত্যের

ছল হেতু তাহার দৃষ্টি বক্র। তাঁহার মানুষ, প্রকৃতি, আনন্দ, বিষাদ সমস্তই সহজ জীবন রসিকতার ও নিগূঢ় অনুভবের পরিচয় বহন করে।'

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটিতে তিতাস তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মালো সম্প্রদায়ের যেন জীবন পাঁচালী। অদ্বৈত মল্লবর্মণ মিথ্যা রোমান্টিকতা দিয়ে নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনকে শৈল্পিকতাতে পূর্ণ করতে চাননি। সৌম জীবনের বাস্তবতা বিবর্জিত অবস্থান থেকে মল্লবর্মণ পর্যবেক্ষণ করেননি; কারণ তিনি নিজেই ছিলেন বাস্তবতার চরম অনিবার্য অংশীদার। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি চার খণ্ডের বড় আকারের উপন্যাস। প্রথম খণ্ডে পর্ব দুটির নাম হচ্ছে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'প্রবাস খন্ড'। দ্বিতীয় খণ্ডে পর্ব দুটির নাম হচ্ছে- 'নয়াবসত' ও 'জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ'। তৃতীয় খন্ড দুটি হচ্ছে- 'রামধনু' ও 'রাঙা নাও'। চতুর্থ খণ্ডে আছে- 'দুরঙা প্রজাপতি' ও 'ভাসমান', সুন্দর এক উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের শুরু করেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ, যা নিম্নরূপ :

> *"তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনের সূর্য তাকে তাড়ায়; রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াইতে বসে। কিন্তু পারে না। মেঘনা-পদ্মার বিরাট বিভীষিকা তার মধ্যে নাই। আবার রমু মোড়লের মরাই, যদু পন্ডিতের পাঠশালার পাশ দিয়া বহিয়া যাওয়া শীর্ণ পল্লীতটিনীর চোরা কাঙ্গালপনাও তার নাই। তিতাস মাঝারি নদী। দুষ্ট পল্লীবালক তাকে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে না। আবার ছোট নৌকায় ছোট বউ নিয়া মাঝি কোনদিন ওপারে যাইতে ভয় পায় না।*
>
> *তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মতো বক্রতা নাই, কৃপণের মতো কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাঁটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়, কিন্তু কাঙ্গাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না। কত নদীর তীরে একদা নী-ব্যবারীদের কুজি-কেল্লা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কত নদীর তীরে মোগল-পাঠানোর তাঁবু পড়িয়াছে, মগদের ছিপনৌকা রক্ত-লড়াইয়ে মাতিয়াছে– উহাদের তীরে কত যুদ্ধ হইয়াছে। মানুষের রক্তে হাতিঘোড়ার রক্তে সেসব নদীর জল*

কত লাল হইয়াছে। আজ হয়ত তারা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু পুঁথির পাতায় রেখ কাটিয়া রাখিয়াছে। তিতাসের বুকে তেমন কোন ইতিহাস নাই। সে শুধু একটা নদী।"

এমনভাবে লেখক বর্ণনা করেছেন নদীর কথা, যা সাবলীল ও ব্যঞ্জনাময়। মালো সম্প্রদায় সমাজে সংস্কৃতির যে স্তরবিন্যাস করে সাধারণকে রুচি ও অনুভবের পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলো। কারণ এর অসাধারণ প্রাণশক্তি। উপন্যাসে লক্ষণীয়-

"মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় যে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বণে, হাসিঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। কারণ মালোদের সাহিত্য উপভোগ আর সকলের চাইতে স্বতন্ত্র। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত তাদের গানগুলো ভাবে যেমন মধুর, সুরেও তেমনি অন্তরস্পর্শী। সে ভাবের, সে সুরের মর্ম গ্রহণ অপরের পক্ষে সুসাধ্য নয়। ইহাকে মালোরা প্রাণের সঙ্গে মিশাইয়া নিয়াছিল, কিন্তু অপরে দেখিত ইহাকে বিদ্রুপের দৃষ্টিতে। আজ কোথায় যেন তাদের সে সংস্কৃতিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে।"

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মালো জীবনকে চিহ্নিত করা হলেও ভিতরে চরিত্রগুলোকে অখণ্ড জীবনরূপে হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান। তিনি বলেছেন-

"মহাকাব্যধর্মী ফ্রেমের মধ্যে যে জীবনকে রূপদান করেছেন ঔপন্যাসিক, তা নদীর মতোই বাঁক পরিবর্তন কারণ, ভাঙন ও নির্মাণশীল। আত্মজৈবনিক পতিভাসের আভাস কখনো কখনো অনুভূত হলেও এ উপন্যাসে ব্যক্তির ফ্রেমকে প্রায়সই অতিক্রম করে যান লেখক। কিন্তু নদীর নামে নাম হলেও এ উপন্যাসের নায়ক তিতাস নয়; নয় কিশোর কিংবা অনন্ত। এ উপন্যাসের নায়ক মালোপাড়া ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের মানবসমষ্টি এবং চলমান সময়।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ নদী ও মৃত্তিকালালিত নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনদের সামূহিক জীবনের খণ্ড-অখণ্ড রূপ মিলিয়ে এক পূর্ণবৃত্ত জীবন

নির্মাণ করেছেন তাঁর উপন্যাসে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, চরিত্রের পরিপূর্ণতার বোধ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বরং জীবনাভিজ্ঞতার পরিপূর্ণতা অঙ্কনের শৃঙ্খলায় চরিত্রসমূহ এক অখণ্ড কেন্দ্রের দিকে ধাবমান। কিশোর, বাসন্তী, অনন্তর মা, অন্ত, এমনকি বনমালী কিংবা কাদেরও অনিষ্ট জীবনেরই অপরিহার্য অংশ। কিশোর, বাসন্তী এবং অনন্ত চরিত্রের রূপায়ন, সূক্ষ্ম বিবেচনায় সমগ্র রূপেই বিন্যস্ত। কেবল অনন্তের মা'র জীবনের যে খণ্ডায়ন তাও কিশোর ও অনন্তর জীবনের পূর্ণবৃত্ত সৃষ্টির প্রয়োজনেই। নদীর কলতান, তার গতি ও পরিবর্তনের সমান্তরাল করে বিচিত্র মানুষের অখণ্ড জীবন রূপ 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে শিল্পরূপ লাভ করেছে। (বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৭, পৃ: ৩০)"

প্রথম খণ্ডের 'তিতাস একটি নদীর নাম' অধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ডের 'প্রবাস' এ পর্বে পরিচয় ঘটে পাঠকের সাথে- সুবল, তিলক, কিশোর, মোড়ল, বাসন্তী ও বেদেনী তরুণীর। আর এই 'প্রবাস' খণ্ডে আমরা মালোপাড়ার স্বরূপ দেখি এবং লৌখিক উপাদানের সংশ্লিষ্টতাও পরিলক্ষিত হতে দেখি-

"তিতাস নদীর তীরে মালোদের বাস। ঘাটে বাঁধা নৌকা, মাটিতে ছড়ানো জাল, উঠানের কোণে গাবের মট্‌কি, ঘরে ঘরে চরকি, টেকো, তকলি-সুতা কাটার, জাল বোনার সরঞ্জাম। এই সব নিয়েই মালোদের সংসার।
নদীটা যেখানে ধনুকের মতো বাঁকিয়েচে, সেইখান হইতে গ্রামটার শুরু। মস্ত বড় গ্রামটা- তার দিনের কলরব রাতের নিশুতিতেও ঢাকা পড়ে না। দক্ষিণপাড়াটাই গ্রামের মালোদের।"

লৌকিক উপাদান এবং মালোদের দ্বারা ব্যবহৃত তাদের প্রতিদিনের জীবনের অঙ্গীভূত লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের খোঁজ নেওয়া যায়। মালোরা কথা কথায় প্রবাদ-বাক্য ব্যবহার করে ঘটনা-উপযোগী বা চরিত্র উপযোগী মন্তব্য করতে যে অভ্যস্ত ছিল, তার প্রমাণ মেলে তাদের ব্যবহৃত প্রবাদ বাক্যে।

শ্যামসুন্দর বেপারী তিন বিবাহের কারণে তিন ছেলের বাবা হওয়া সত্ত্বেও চতুর্থবার এক অল্প বয়সী বালিকাকে বিয়ে করবে বলে ভাবে। এক্ষেত্রে এক বয়সী মহিলা মন্তব্য করেছে- 'কাকের মুখে সিন্দুইরা আম'।

এখানে বালিকাকে সিন্দুইরা আমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আরেক দিকে কাকের সঙ্গে উপমিত হয়েছে বেপারী। সে যে কন্যার উপযুক্ত স্বামী নয়, তারও ইঙ্গিত এখানে রয়েছে। এ রকম অসংখ্য প্রবাদ রয়েছে এ পর্বে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ মন্তব্য করছেন মালোদের 'পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত তাদের গানগুলি ভাবে যেমন মধুর, সুরেও তেমনি অন্তরস্পর্শী। সে ভাবের সে সুরের মর্ম গ্রহণ অপরের পক্ষে সুসাধ্য নয়।' লেখক দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, 'অধুনা মালোরা সে সব গান ভুলিয়া যাইতেছে। মায় মন্ডলের ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে নারীরা সমবেত সঙ্গীতে অংশ নেয়।

'সখি এত ফুলের পালঙ রইলো,
বাই কালাচাঁদ আইলো।'

এরকম আরো সংগীতের ব্যবহার করা হয়েছে এ খণ্ডে।

এ প্রসঙ্গে লেখকের বর্ণনাংশ লক্ষণীয়-

'এ পাড়ার কুমারীরা কোনকালে অরক্ষণীয়া হয় না। তাদের বুকের উপর ঢেউ জাগিবার আগে, মন যখন থাকে খেলার খেয়ালে রঙিন, তখনই একদিন ঢোল সানাই বাজাইয়া তাদের বিবাহ হইয়া যায়। তবু এ বিবাহের জন্যে তারা দলে দলে মাঘমণ্ডলের পূজা করে।

মাঘ মাসের ত্রিশ দিন তিতাসের ঘাটে প্রাতঃস্নান করিয়াছে প্রতিদিন স্নানের শেষে বাড়িতে আসিয়া ভাঁটফুল আর দূর্বাদলে বাঁধা ঝুটার জল দিয়া সিঁড়ি পূজিয়াছে, মন্ত্রপাঠ করিয়াছে: 'লও লও সুরুজ ঠাকুর লও জুঠার জল, মাপিয়া পুখিয়া দিব সপ্ত আঁজল।'

তরুণ কলাগাছের একহাত পরিমাণ লম্বা করিয়া কাঁটা ফালি, বাঁশের সরু শলাতে বিঁধিয়া ভিত করা হয়। সেই ভিতের উপর গড়িয়া তোলা হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারি ঘর। আজিফার ব্রত শেষে ব্রতিনীর সেই চৌয়ারি মাথায় করিয়া তিতাসের জলে ভাসাইবে। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল-কাঁশি বাজিবে, নারীরা গীত গাহিবে।"

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে 'নয়াবসত/জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ'। এ খণ্ডটি কাহিনির চার বছর পর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই চার বছরের কোন বিবরণ উপন্যাসে নেই।

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বের নামেই বোঝা যায় জীবনের কথা। এ পর্বটি লেখক আনন্দের মা, সুবলার বউ, পাগল কিশোর- এই তিনজনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। মালোপাড়ার পরিবেশে বসবাসের জন্য অনন্তর মা অনুমোদনের জন্য যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে তা ঔপন্যাসিকের বর্ণনাংশে লক্ষ করা যায়–

> *"অবশেষে উঠিল অনন্তর-মার কথা। তার বুক দুরদুর করিতে লাগিল। এ কথাটাও ভারতকেই তুলিতে হইল, নতুন যে লোক আসিয়াছে, আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন। তারে নিয়া কীভাবে সমাজ করিতে হইবে আপনারা বলিয়া যান। তারে কার সমাজে ভিড়াইবেন, কিষ্ট কাসার, না দয়াল কাকার, না বসন্তর বাপ কাকার-কৃষ্ণচন্দ্র বলিল, 'কোন সৃষ্টির মানুষ আগে জিগাইয়া দেখ কোন কোন জাগায় কেতয়াতি আছে জান।' আদেশ মতো সুবলার বউ তাকে জিজ্ঞাস করিল।*
>
> *অনন্তর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'ভইনসকল গুষ্টি-জ্ঞিয়াতির কথা, আমি কিছু জানি না।'*
>
> *শুনিয়া সকলেই নিরুৎসাহ হইল। কেহই তাহাকে নিজের সমাজে লইতে আগ্রহ দেখাইল না।*
>
> *কৃষ্ণচন্দ্র বলিল, 'আমার সমাজ বিশ ঘরের। ঘর আর বাড়াইতে চাই না।'*
>
> *দয়ালচাঁদের সমাজও দশ ঘরের। প্রত্যেকটাই বড় ঘর। তার সমাজও ঠাঁই হওয়া অসম্ভব।*
>
> *মঙ্গলী বসিয়াছিল সকলের পশ্চাতে। ঠেলিয়া ঠুলিয়া আগাইয়া আসিয়া সে বলিল 'আমার সমাজ মোটে তিন ঘরের।'*
>
> *রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, 'কারে কারে লাইয়া তোর সমাজ।'*
>
> *'সুবলার শ্বশুর আর কিশোরের বাপের লইয়া।'*
>
> *'তা হইলে নতুন মানুষ লইয়া তোর সমাজ হইল চাইর ঘর।'*
>
> *'হ কাকা।'*

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের 'জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ' খণ্ডটিতে মূলত মালো সম্প্রদায়ের জীবনাচারের বিষয়টি প্রতিপন্ন হয়েছে।

মালোপাড়ায় রামকেশরের পরিবারের বেদনাময় চিত্র এবং কালোবরণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনচিত্র এই জনপদের অসংখ্য মানুষকে দেয় বৈচিত্র্যময়তা।

'নয়া বসত' শীর্ষক পরিচ্ছেদে জারির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। জারি মুসলিম সমাজে প্রচলিত লোকসংগীত। কারবালার যুদ্ধ এই গানের উপজীব্য। একই সঙ্গে বীর ও করুণ রসের আধার জারি গান পরিবেশন নৈপুণ্যে, বিষয়বস্তুর কারণে ও সর্বোপরি বীর ও করুণ রসের অনবদ্য সমন্বয়ে রচিত জারি গান সকল শ্রেণির শ্রোতাকেই আকৃষ্ট করে। বর্তমান অধ্যায়ে জারির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে রামপ্রসাদ বাহারুল্লাহর কাছে। বাহারুল্লার উঠানে যে কত জারি গানের অনুষ্ঠান হয়েছে, সে বিষয়ে স্মৃতিচারণায় মগ্ন হয়েছে রামপ্রসাদ স্মৃতির সরণি বেয়ে জারি শিখিয়ে তারপর পাল্টা কোনো দলকে নিমন্ত্রণ করে এনে জারির প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত। রামপ্রসাদ মন্তব্য করেছে, 'ভাই গানগুলো কি ভালো লাগত!' প্রসঙ্গত দুটি গানের উল্লেখও সে করেছে, যে দুটির সুর তার মরমে গেঁথে গিয়েছিল-

ক. 'জয়নালের কান্দনে, মনে কি আর মানে রে, বিরিক্ষের পত্র ঝরে।'

খ. 'মনে লয় উড়িয়া যাই কারবালার ময়দানে।'

বাহারুল্লা আবার আর একটি গানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে রামপ্রসাদকে-

'বাছা তুমি রণে যাইও না, চৌদিকে কাফিরের দেশ,
জহর মিলে ত পানি মিলে না।'

বাহারুল্লা জানিয়েছে তাদের জারি গান করার ফুরসৎ নেই। কেননা, লোন কোম্পানির টাকা এনে তা শোধ দিতে না পারায় প্রতি কিস্তিতে কতই না শাসানি ধমক খেয়ে মরছে। তাই জারি গান করার আনন্দ তাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

কালোবরণের সেজ পুত্রবধূর পুত্র সন্তান হেতু যে অশৌচ হয়েছিল, তার অবসানে প্রচলিত লোকাচার মানার সঙ্গে সঙ্গে পুরনারীরা সমবেত কণ্ঠে শুরু করেছিল গান-

'দেখ রাণী ভাগ্যমান,
রাণীর কোলেতে নাচে দয়াল ভগবান।
নাচ রে নাচ রে গোপাল খাইয়া ক্ষীর ননী,
নাচিলে বানাইয়া দিব হস্তের পাচনি।

একবার নাচ দুইবার নাচ তিনবার নাচ দেখি,
নাচিলে গড়াইয়া দিব হস্তের মোহন বাঁশি।'

আসলে সংগীত আমাদের জীবনের সকল পর্যায়ের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে যে যুক্ত, তারই প্রমাণ।

পশ্চিম পাড়ার বাসিন্দা ময়না, যার কাজ পাখি শিকার করা, আঁস্তাকুড়ের পাশের ছিটকি গাছের জঙ্গলে একটি পাখিকে তাক করে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে, ময়না গান ধরেছিল গুন্‌গুন্‌ করে

'টিয়া পাললাম, শালিক পাললাম,
আরও পাললাম ময়না রে।
সোনামুখী দোয়েল পাললাম,
আমার কথা কয় না রে।'

-এও লোকসংগীত, অবশ্যই প্রচলিত।

রমু খালের পারে হাঁড়ি বোঝাই নৌকা থেকে ভেসে আসা বারমাসী গান শুনে মুগ্ধ হয়েছে।

১৯৩৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত 'নবশক্তি' পত্রিকায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'দুটি বারমাসী গান' প্রকাশ উপলক্ষে লিখেছিলেন-

"পল্লী' অঞ্চলের নিরক্ষর লোকেরা যেসব গান গাহিয়া তাহাদের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, অবসর বিনোদন করে কিংবা গুরু শ্রমভার লাঘব করে সেগুলোর মধ্যে বারমাসী গানগুলোই সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়।... তাহারা গান গায় কাজ করিতে করিতে। গানে যশ লাভের স্বপ্ন তাহাদের মধ্যে খুবই কম। প্রাণের সহজ স্ফুর্তিতে তাহারা আবেগ ভরে গানগুলি গাহিয়া যায়।... পল্লীরই অজ্ঞাত নাম-হারা কবিরা গ্রাম্য ভাষায় এবং গ্রাম্য সুরে, গ্রাম্য বিষয়বস্তু লইয়া গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। কৃষকেরা ধান কাটিবার কালে বা নালিতা নিড়াইবার কালে, জেলেরা জাল বুনিবার কালে এবং নদীর মাঝিরা নৌকা বাহিতে বাহিতে এই সকল গান গাহিয়া তাহাদের শ্রম লাঘব করে।" অর্থাৎ লেখকের মতে বারমাসী গান এক শ্রম সংগীত। রমুর শোনা পাতিলের নাইয়া গীত বারমাসীটি ছিল এই রকম-

'হায় হায় রে, এহিত চৈত্র না মাসে হিরস্তে বুনে বীজ।
আন গো কটোরা ভরি খাইয়া মরি বিষ ॥
বিষ খাইয়া মইরা যামু কান্‌বে বাপ মায়।
আর ত না দিবে বিয়া পরবাসীর ঠাঁই ॥'

*   *   *   *

'আসিল আষাঢ় মাস হায় হায়রে,
এহিত আষাঢ় মাসে গাঙে নয়া পানি।
যেহ সাধু পাচে গেছে সেহ আইল আগে।
হাম নারীর প্রাণের সাদু খাইছে লস্কার বাঘে ॥'

*   *   *   *

'হায় হায় রে, এহিমত পৌষ না মাসে পুষ্প অন্ধকারী।
এমন সাধের যৈবন রাখিতে না পারি ॥
কেহ চায় রে আড়ে আড়ে চায় রে রইয়া।
কতকাল রাখিব যৈবন লোকের বৈরী হইয়া।'

-এ তো গান নয়, যেন বিচ্ছেদ-আকুলা নারীর এক বুক-সেঁচা ফরিয়াদ।

প্রোষিতভর্তৃকা নারী মাসের পর মাস প্রিয় বিচ্ছেদের দুঃখভার বহন করে মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে শেষে গানের মাধ্যমে সেই দুঃখকে বিকীর্ণ করে দিয়ে কিছুটা হালকা হওয়ার চেষ্টা করছে।

'তিতাস একটি নদীর নাম'র উপজীব্য বিষয় হলো মাঝি ও জেলেদের জীবন পাঁচালী। স্বভাবতই তাই সারিগানের প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে বিস্তারিতভাবে এসেছে। শুধু গানের Text উল্লেখ করেই লেখক তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি। এই গানের পরিবেশ, এমনকি গানের প্রতিক্রিয়ারও বিবরণ দিয়েছেন। সেদিক থেকে বলা যায় লেখক Contextual Study-র স্বাক্ষর রেখেছেন।

সারি নৌকা বাইচের গান, অতি দ্রুত লয়ের গান, নৌকার গতি যত বৃদ্ধি পায় সারিগানর লয়ও ততই বাড়ে। নৌকা বাইচের নৌকার গড়ন পৃথক ধরনের। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন- *"গলুইটা জলের সমান নিচু। সরু ও লম্বা পাছাটা পেটের পর হইতে উঁচু হইয়া গিয়া আকাশে ঠেকিয়াছে; হালের কাঠিটা তির্যকভাবে আকাশ ফুঁড়িবার মতলবে যেন উচাইয়া উঠিয়াছে।"*

এই বার সারিগানের প্রসঙ্গের অবতারণা করা যেতে পারে।

হালের কাঠিটা ধরে 'একটা লোক নাচিতেছে আর পাটাতনে পদাঘাত করিতেছে। উপরে দাঁড়াইয়া একদল লোক খোল করতাল বাজাইয়া সারি গাহিতেছে। আর তাহারই তালে তাল দুই পাশে শত শত বৈঠা উঠিতেছে নামিতেছে, জল ছিটাইয়া কুয়াশা সৃষ্টি করিতেছে। সারিগানের অপরিহার্য উপকরণ হলো ঢোলক এবং কয়েক জোড়া করতাল।'

এইবার সারিগানের text-এর প্রসঙ্গেঃ

'আকাঠ মান্দাইলের নাও, ঝুনুর ঝুনুর করে নাও,

জিত্যা আইলাম রে নাওয়ের গলুই পাইলাম না ॥'

অপেক্ষাকৃত গদ্যভাবের সারি গানও উল্লিখিত হয়েছে-

'চাঁদমিয়ারে বলি দিল কে, দারোগা জিজ্ঞাসে,
আরে চাঁদমিয়ারে বলি দিল কে?'

-এটি যে সমসাময়িক বিষয় অবলম্বনে রচিত, তা শ্রোতামণ্ডলীর প্রতিক্রিয়াতেই বোঝা গেছে। দর্শকদের মধ্যে একজন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছে-

'ও, চিনিয়াছি, বিজেশ্বর গ্রামের নাও, চর দখল করিতে গিয়া উহারাই খুনোখুনি করিয়াছিল।'

আগের গানটিতে উদয়তারার নামটি যুক্ত করায় সে খুব খানিক হেসে মন্তব্য করেছে, *"খুব ত গান। মাঝখানে আমার নামখানি ঢুকাইয়া থুইছে।"*

অপর একটি সারিগানের কথা হলো-

'জ্যৈষ্ঠি না আষাঢ় মাসে যমুনা উথলে গো,
যাইস না যমুনার জলে।
যমুনার ঘাটে যাইতে দেয়ার করল আন্ধি।
পন্থহারা হইয়া আমরা কিষ্ণ বলে কান্দি ॥
যমুনার ঘাটে যাইত বাইে-ঘরে জ্বালা,
বসন ধরিয়া টানে নন্দের ঘরের কালা ॥'

বড় বাড়ির কজন উদারতারার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল যে গানটিতে, সেটি ছিল লঘু বিষয়ের-

'ও তোরে দেখি নাইরে কাল সারা রাত কোথায় ছিলি রে।
থানায় থানায় চকিদার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে,
কোন কোন নারীর শুভ বরাত, আমার বরাত পুরে-
বরাত পুইড়া গেলরে, কাল সারারাত কোথায় ছিলি রে ॥'

পেট মোটা পাতাম নাও থেকে ভেসে আসা বারিটি ছিল আবার অন্য ধরনের-

'সামনে কলার বাগ, পুব-দুয়ারী ঘর
রাইতে যাইও বন্ধু, প্রাণের নাগর ॥'

যে গানটির প্রতি অন্তবালাকে সকলে মনোযোগী করে তুলল, সেটি ছিল এই রকম-

'ঝিয়ারীর মাথায় লম্বা কেশ,
খোঁপা বান্ধে নানা বেশ,
খোঁপার উপর গুঞ্জরে ভোমরা ॥
গাঙে আইলে আঞ্জন মাঞ্জন,
বাড়িতে গেলে কেশের যতন,
ঝিয়ারী জানি কোন পীতের মরা ॥'

লেখক সারিগান পরিবেশনের মুহূর্তটিকেও নিপুণ শিল্পীর মতো জীবন্তরূপে আমাদের উপহার দিয়েছে-

"বৈঠা জলে ছোঁয়াইয়া একসাথে শত শত বৈঠাকে উল্টাইয়া উপরে তুলিতেছে আর বৈঠার গোড়াটাকে একই সাথে নাওয়ের বাতায় ঠেকাইয়া বৈঠাধারীরা সামনের দিকে ঝুঁকিতেছে, আবার বৈঠা তুলিয়া জলে ফেলিতেছে। যেন হাজার ফলার একখানা ছুরি যাইতেছে আর তার সবগুলি ফলা একসাথে উঠিতেছে পড়িতেছে আবার খাড়া হইয়া শির উচাইতেছে। মাঝখানে থাকিয়া একদল লোক গাহিতেছে, আর বৈঠাধারীরা সকলে এক তালে সে গানের পদগুলির পুনরাবৃত্তি করিতেছে।"

শেষ যে নৌকা বাইচের গানটি উল্লিখিত হয়েছে সেটি হল-

'সকলের সকলি আছে আমার নাই গো কেউ।
আমার অন্তরে গরজি উঠে সমুদ্দুরের ঢেউ।
নদীর কিনরে গেলাম পার হইবার আশে।
নাও আছে কান্ডারী নাই শুধু ডিঙ্গা ভাসে ॥'

ভাটিয়ালি গানকে লেখক অভিহিত করেছেন *'মালোদের প্রাণের গান'* বলে। আরও বলেছেন, *'যতদূরেই থাক, এর সুর একবার কানে গেলে আর যায় কোথা। অমনি সেটি প্রাণের ভিতর অনুরণিত হইয়া উঠে। কাছে থাকিলে সকলের সঙ্গে গলা মিলাইয়া গায়। দূরে থাকিলে আপন মনে গুন গুন করিয়া গায়।'* উদয়চাঁদের সঙ্গে সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে ভাটিয়ালিটি গেয়েছে সেটি হল-

'না ওরে বন্ধ বন্ধ, কি আরে বন্ধ রে,
তুই শ্যামে রাধারে করিলি কলঙ্কিনী।
মথুরার হাটে ফুরালি বিকিকিনি॥

না ওরে বন্ধু-
তেল নাই, সলিতা নাই, কিসে জ্বলে বাতি।
কেবা বানাইল ঘর কেবা ঘরের পতি॥
না ওরে বন্ধু-
উঠান মাটি ঠন্ ঠন্ পিড়া নিল সোতে।
গঙ্গা মইল জল-তিরাসে ব্রহ্মা মইল শীতে॥'

লোকসংগীতের মতো না হলেও কিছু কিছু লৌকিক ছড়ার প্রয়োগও আমরা লক্ষ করি উপন্যাসটিতে। কালোবরণের মাকাক তাড়াতে ছড়া কেটেছে হাতে কঞ্চি দুলিয়ে-

'কাউয়ার দাদী মরল,
কুলা দিয়া ঢাকল,
দূর হ কাউয়া দূর!

বনমালীর বোন তার শৈশবে রামধনু দেখে ঐন্দ্রজালিক ছড়া আবৃত্তি করেছিল হাততালি দিয়ে। পরবর্তীকালে রামধনু দেখে বনমালীর তা মনে পড়ে গেছে। ছড়াটি এরকম-

'রামের হাতের ধেনু,
লক্ষ্মণের হাতের ছিলা,
যেইখানে ধেনু,
সেইখানে গিয়া মিলা'।

-এটা আবৃত্তি করলে রামধনু মিলিয়ে যায় বলে ধারণা প্রচলিত ছিল। সাদকপুরের বনমালীর বোনটি, যে পরিণয়সূত্রে লবচন্দ্রের বউ, তার মালোপাড়ায় বিশেষ খাতির ছিল একটি কারণে, *'কথার মাঝে মাঝে সুন্দর ছড়া কাটিতে পারে বলিয়া সকল নারীরা তাকে একটু সমীহ করে, সে যেন দশ জনের মাঝে একজন।'*

প্রচণ্ড ঝড়কে প্রশমিত করতে ছড়ার ন্যায় আবৃত্তি করা হয়- *'দোহাই রামের, দোহাই লক্ষণের, দোহাই বাণ রাজার, দোহাই ত্রিশকোটি দেবতার।'* আরও বলা হয়- *'এই ঘরে তোর ভাইগ্না বউ, ছুইস না ছুইস না- এই ঘরে তোর ভাইগ্না বউ, ছুইস না ছুইস না। যা বেট যা, পাহাড়ে যা, পর্বত যা বড় বড় বিরিক্ষের সনে যুদ্ধ কইরা যা।'* এই সবই ঐন্দ্রজালিক ছড়া। এক্ষেত্রে ঝড়ে সত্তা আরোপ করায় সর্বপ্রাণবাদ স্বীকৃত হয়েছে।

ছাদির রমুকে নিয়ে তিতাসে স্নান করতে গেলে রমু তার বাবাকে ধরে পড়ে তাকে নিয়ে পাতালে যাবার জন্য। ছাদির ছেলের খুশিতে হাত দুটো জলের উপর তুলে তালি বাজাতে বাজাতে বলে উঠেছে-

'দম্ব দম্ব তাই তাই,
ঠাকুর লইয়া পূবে যাই।'

নয়নতারা তার ছোট বোন উদয়তারাকে বলেছে, *'উদয়তারা শিলোকের রাজা।'* শিলোক অর্থাৎ ধাঁধা। নবীনাগরের বউটি উদয়তারাকে *'জামাই ঠকানী'* বিশেষণে বিশেষিত করেছে। এই জামাই ঠকানো ব্যাপারটি ধাঁধা, যা জিজ্ঞাসা করে জামাইকে বিমূঢ় করবার চেষ্টা করা হয়। উদতারা নিজে অবশ্য একে বলেছে *'ছড়া'*।

নদীর নির্জন বুকের বিশ্রী নীরবতা ভঙ্গ করতে অনন্তকে সে প্রশ্ন করে বসে-

'সু-ফুল ছিট্যা রইছে, তুলবার লোক নাই;
সু-শয্যা পইড়া রইছে, শুইবার লোক নাই।'

অনন্ত এর জবাব দিতে পারেনি, তখন উদয়তারাই বলে দিয়েছে উত্তর, *'আসমানের তারা।'*

পিঠে তৈরি করার সময় গভীর রাতে ঘুমের মোকাবিলা করার জন্য শিলোক আহ্বান করেছে নয়নতারা তার ছোট বোন উদয়তারার কাছে। উদয়তারাও সাড়া দিয়েছে। প্রশ্ন করেছে-

'হিজল গাছে বিজল ধরে,
সন্ধ্যা হইলে ভাইঙ্গা পড়ে?'

সেজো বোন আসমানতারা এর সঠিক উত্তর দিয়েছে, বলেছে, 'হাট', পুনরায় প্রশ্ন উদয়তারার-

'পানির তলে বিন্দাজী গাছ ঝিকিমিকি করে,
ইলসা মাঠে ঠোকর দিলে ঝরঝরাইয়া পড়ে?'

এটির উত্তর দিয়েছে নয়নতারা, *'কুয়াসা'*।

উদয়তারার পরের প্রশ্ন-

'আদা চাক্‌চাক্ দুধের বর্ণ,
এ শিলোক না ভাঙ্গাইয়া বৃথা জন্ম।
উত্তরটি হল 'টাকা'।

এক সময়ে ধাঁধার যে কিছু সামাজিক উপযোগিতা ছিল, লেখক তার পরিচয় রেখেছেন তাঁর উপন্যাসে। দ্বিরাগমনে আসা এক অবিবেচককে খুব করে ঠকানোর পরিকল্পনা করে একজন মহিলা প্রস্তাব করেছে, *'ভয় কি জামাই ঠকানী আছে, বনমালীর বোন জামাই ঠকানী।'*

জীবন কখনই লোকাচার, লোকবিশ্বাস কিংবা সংস্কার বর্জিত হতে পারে না। তিতাস নদীকে অবলম্বন করে যাদের জীবিকা নির্বাহ, অস্তিত্ব রক্ষা, সেই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনের পরতে পরতে যে বিশ্বাস-সংস্কার শিকড় গাড়বে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে !

জোবেদ আলীর তিন জোয়ান ছেলে আলু পারে লাগিয়ে তারপর তিনবার আলীর নাম স্মরণ করে তাদের লম্বা ডিঙ্গিখানির যাত্রী হয়েছে। আলীর নাম স্মরণ করা হয়েছে যাত্রা যাতে শুভ হয় সেই আশায়।

দুজন মুনীস চার জোড়া বলদ ও দুইজোড়া ষাঁড়কে জোর করে শীতের জলে নামিয়ে গরুদের লেজ ধরে আল্লাহ আলার মোমিন বলে সাঁতার দিয়েছে। আল্লাহ ও মোমিনের নাম স্মরণ করলে কোন বিপদাশঙ্কা থাকে না বলে বিশ্বাস।

কালোবরণের মেজ ছেলের বউ পুত্রসন্তান প্রসব করলে ছয়দিনের দিন নবজাতকের ঘরে দোয়াত আর কলম রাখা হলো। লোকবিশ্বাস, এই রাতে চিত্রগুপ্ত স্বয়ং এসে ঐ দোয়াত থেকে কালি তুলে সেই কলমের সাহায্যে শিশুর কপালে লিখে রেখে যায় তার ভাগ্যলিপি।

আট দিনের দিন অনুষ্ঠিত হয় আট-করাই। পাড়ার ছেলেদের দেওয়া হয় খই, ভাজাকলাই, বাতাসা ইত্যাদি।

নবজাতকের জন্মের তের দিন পরে হয় অশৌচান্ত। এই দিন বাড়ির সবকিছু ধোওয়া মোছা করা হয়। নাপিত এসে পুরুষদের দাড়ি কামিয়ে দেয়। পুরোহিত এসে মন্ত্র পড়ে। এই দিন উঠানে একটি চাটাই পেতে তাতে ধান ছড়িয়ে দেওয়া হয়। নতুন শাড়ি পরে সদ্য সন্তানের জননী হওয়া নারী চাটাইয়ের উপর উঠে ধানগুলো পায়ের সাহায্যে সারা চাটাইয়ে ছড়িয়ে দেয়। কালোবরণের মেজ বৌমাও তা করেছিল।

অন্নপ্রাশনের অঙ্গস্বরূপ হলো স্নানযাত্রা। কালোবরণের ছোট বউমা তার সন্তানের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তিতাসের ঘাটে গেছে সন্তানকে কোলে নিয়ে। অন্যান্য নারীরা তার সহগমন করেছে। এরপর ছোট বউ নিজে তিতাসকে তিনবার প্রণাম করেছে, ছেলেকেও তিনবার প্রণাম করিয়েছে। এরপর এক অঞ্জলি জল দিয়ে ছেলের মাথা ধুইয়েছে। শাড়ির আঁচলে সেই জল মুছিয়ে ফের নদীকে নমস্কার করে বাড়ি ফিরেছে। যে নদী এদের জীবনের সঙ্গ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, সুখে-দুঃখে সকল অনুষ্ঠানে-আচারে সেই নদী যে একটা

ভূমিকা নেবেই। তা বলা বাহুল্য। বিশেষত আজকের সদ্যোজাত শিশু আগামী দিনে তিতাসের পোক্ত জেলেতে পরিণত হবে, ধরবে মাছ তিতাসের বুক থেকে, চালাবে নৌকা নদীর বুকে; জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করবে তিতাসের বুকে, তাই সেই শিশু জীবনারম্ভের, বিশেষত অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তিতাসকে প্রণতি জানাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেননা এই তিতাসই তার আহার্যের সংস্থান করবে ভবিষ্যৎ জীবনে।

অনন্ত তার মৃত মাকে উদ্দেশ করে যে আহার্য দিয়েছে, তা দিয়েছে তিতাসের পারে। একটি কলার খোলে ভাত ব্যঞ্জন সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সঙ্গে দেওয়া হয়েছে পান, সুপারি, তামাক ও টিকা যা জীবন্ত অবস্থায় অনন্তর মা গ্রহণ করত। সাদকপুরের বনমালীর বোন অনন্তের সঙ্গে গিয়েছে এবং অনন্তকে নির্দেশ দিয়েছে, *'পাছ ফিরা আইয়া পড়, আর পিছনের দিকে চাইস না।'* এ এক ধরনের সংস্কার।

লোকে তেমাথায় রোগীকে স্নান করিয়ে ফুল দিয়ে রাখে, বিশ্বাস যে পা দেবে তারই মরণ।

দোল উপলক্ষে একটি বিচিত্র লোকাচার পালিত হয়। একজনকে হোলির রাজা সাজানো হয়। তার গলায় পরানো হয় কলাগাছের খোলের মালা, মাথায় কলাপাতার টোপর, পরনে ছেঁড়া ফতুয়া। শুকদেবপুরের মানুষ এভাবেই হোলির উৎসব পালন করছে।

মোড়ল গিন্নী কিশোরের সঙ্গে তার ভালো লাগা মেয়েটির মালা বদলের ব্যবস্থা করে ফেলেছে জেনে মেয়েটির মা অনুরোধ করেছে, দেশে ফিরে যতক্ষণ পর্যন্ত না কিশোর শাস্ত্রমতে বিবাহ করে, ততদিন পর্যন্ত যেন আর উভয়ের সাক্ষাৎ না হয়। কেননা তাতে 'অমঙ্গল হয়', এও এক ধরনের ট্যাবু।'

অনন্তর মা এক মহিলাকে বেশি বটপাতা খেতে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। বটপাতা হলো পানপাতা। যে মহিলা বটপাতা বলেছে পানকে, তার মূলে কাজ করেছে একটি tabbo তা হল শ্বশুরের মতো গুরুজনের নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ। মহিলারা শ্বশুরের নাম 'পান্তব', তাই সে 'পান কইতে পারে না, পানেরে কয় বটপাতা।'

বেঘোরে কেউ মারা গেলে তার আত্মার নাকি মুক্তি হয় না এবং তার প্রেতাত্মা মানুষের ক্ষতি করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এরা রাতেই বেশি সক্রিয় থাকে, তাই পোড়ো বাড়ি, বিশেষত যে বাড়ির কারো অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে, সেই বাড়ির কাছ দেয়িে রাতে কেউ চলাচল করে না। পোড়ো মালীবাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পথে রাতে কেউ হাঠৎ না বলে জানানো হয়েছে। লোকবিশ্বাস, *'বেঘোরে মরা মালিনীর প্রেতাত্মা এখানে মূর্তি ধরিয়া পথিককে ভেংচায়।'*

দোলের সময়ে জেলেরা, মাঝিরা নিজেরাই যে কেবল রঙের খেলায় মাতে তা নয়, এই সময়ে নৌকাকেও তারা সাজায় এবং একটি লোকাচার পালিত হয়। বাড়ির বৌ-ঝিরা সঙ্গে নেয় ধানদূর্বা, আর ছোট থলেতে নেয় আবির। নৌকা থেকে পুরুষ মানুষটি আবিরসহ থালাটি নিয়ে তা থেকে নৌকার মাঝের এবং গলুইয়ে নিষ্টার সঙ্গে আবির মাখিয়ে দেয়। তারপর ধান দূর্বাগুলো দুই আঙ্গুলে তুলে ভক্তিভরে আবি মাখানো জায়গাটুকুর উপরে রাখে। নৌকা জেলেদের কাছে পরিবারের একজনের মতোই, কিংবা তারও থেকে বেশি। তাই দোল উপলক্ষে তাকেও রঞ্জিত না করে পারে না। ভালোবাসার রং যে লাল। অবশ্য শুধুই ভালোবাসা নয়, সেই সঙ্গে তারা ধানদূর্বা দিয়ে ভক্তিও নিবেদন করে এবং ধানদূর্বার মতোই অসংখ্য মাছ নৌকার সাহায্যে যাতে ধরা পড়ে সেই শুভ প্রার্থনা নিবেদন করে।

তিনবার সত্য করলে, মনে করা হয় সত্য যে করে সে কোনো অবস্থাতেই তা ভঙ্গ করবে না। গগন মালোর নিজস্ব কোনো নৌকা বা জাল ছিল না। বিবাহের সময় সে কিন্তু শ্বশুরের কাছে নিজের নৌকা, জাল সব করবে বলে তিন সত্যি করেছিল, তবেই সে সুবলের মাকে লাভ করে পত্নীরূপে। কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয় এতদ্‌সত্ত্বেও গগন মালো সত্য রক্ষা করেনি, আর সুবলের মা এই কারণে তাকে খোঁটা দিতে ছাড়ত না।

কিশোর তিলককে ভাত চাপাতে বলে নৌকার গলুইয়ে একটু জল দিয়ে প্রণাম করে তবেই দাঁড় ফেলতে শুরু করেছে। সুবলকে কিশোর জানিয়েছে বার গাঙে ভয়ের কিছু নেই। কেননা, সেখানে স্বয়ং মা গঙ্গা অবস্থান করেন এবং বিপদের নাইয়ারে রক্ষা করেন।

যেহেতু উপন্যাসটি তিতাস নদী ও তার ওপর নির্ভরশীল মালোদের নিয়ে রচিত, তাই স্বভাবতই মালোদের জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ঠ নৌকা, জাল ইত্যাদির প্রসঙ্গ বারংবার এসেছে। বাইচের নৌকার বিবরণ দিয়েছেন লেখক, যার নাম দেওয়া হয়েছে *'রাঙা নাও'*। লেখকের বর্ণনানুসারে-

'গলুইটা জলের সমান নিচু। সরু ও লম্বা পাছাটা পেটের পর হইতে উঁচু হইয়া গিয়া আকাশে ঠেকিয়াছে; হালের কাঠিটা তির্যকভাবে আকাশ ফুড়িবার মতলবে যেন উচাইয়া উঠিয়াছে।'

গৌরাঙ্গ কল্পনা করেছে অনন্ত বড় হলে তিতাসের অগাধ জলে বৈরব জাল, ছান্দি জাল, ভেসাল জাল ইত্যাদি পেতে বসবে। এসব জালের নানা প্রকারভেদ।

কিশোর কর্তৃক নৌকার জল সেউতির সাহায্যে সেচে ফেলার কথা মেলে। নৌকার গলুই, দাঁড় ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন লেখক।

শুকদেবপুরের বাঁশি রায় মোড়লদের গ্রামে কিশোর ঘরে ঘরে দেখেছে গাবের মটকি, জালের পুঁটুলি, ঝুড়ি, ডোলা ইত্যাদি মাছ ধরার বিভিন্ন উপকরণাদি।

তিন কোণাবিশিষ্ট ঠেলা জালের প্রসঙ্গও উপন্যাসে এসেছে। বিজয় নদীর এমনই দুর্দশা যে, সেখানে এ ধরনের জালই ব্যবহৃত হয়। এই জাল হাঁটু জলে ঠেলে নিয়ে যেতে হয়, লম্বায় এ্ জাল মাত্র হাত তিনেক।

বাসন্তীর মা অনন্তের মৃত্যু কামনা করে বলেছে তার মৃত্যু হলে সে সুবনীয় পূজা দেবে।

'প্রবাস' খণ্ডে কুমারী মেয়েদের দ্বারা অনুষ্ঠেয় মাঘমণ্ডলের ব্রত বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। বিবাহের আশাতেই মাঘমণ্ডলের ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন, মাঘ মাসের ত্রিশটি দিন তিতাসের পরে বসবাসকারী মালোদের মেয়েরা তিতাসে প্রাতঃস্নান করে স্নানের শেষে বাড়িতে এসে ভাটফুল এবং দুর্বা দিয়ে বাঁধা ঝুটার জল দিয়ে সিঁড়ি পূজা করেছে আর ছড়া আবৃতি করেছে-

'লও লও সুরুজ ঠাকুর লাও ঝুটার জল,
মাপিয়া জুখিয়া দিব সপ্ত আঁজল।'

মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে মেয়েরা চৌয়ারি মাথায় করে তিতাসের জলে ভাসিয়ে দেয়। সঙ্গে বাজে ঢোল-কাসি, নারীরা গায় গীত। 'চৌয়ারি', তৈরির বিবরণ এরকম কলাগাছের এক হাত পরিমাণ লম্বা কাটা ফালি, বাঁশের সরু শলাতে বিঁধে ভিত করে তার উপর রঙিন কাগজের চৌয়ারি ঘর নির্মাণ করা হয়।

রমুর মার বাপের বাড়ি হিন্দুপাড়ার নিকটে। সে প্রশান্ত গোয়াল ঘরটি ভালো করে নিকিয়ে নিয়ে কলসি থেকে চিড়ে বের করে ক্ষিপ্রহস্তে কুলোতে করে তা ঝেড়েছে। এখানে চিড়ে একদিকে লোকখাদ্য এবং কুলো লোক তৈজসের পরিচিত দৃষ্টান্ত।

সুবলার বউ বিপর্যস্ত শীররে বাড়ি ফিরে কাউকে কিছু না বলে 'পাটি' বিছিয়ে শুয় পড়েছে। পাটি গ্রামীণ জীবনের প্রায় অপরিহার্য উপকরণ, মাদুরের মতো তা ব্যবহৃত হয়। বাঁশিরায় মোড়লের বাড়ি কিশোরদের বিশ্রামের জন্য শীতল পাটি বিছিয়ে দেওয় হয়েছিল।

আহত সুবলার বউকে তার মা এক বাটি হলুদ বাটা গরম করে এনে লাগাতে বলেছে। গরম হলুদ বাটা লোক ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয়, যা ব্যথা বিশেষত মচকানো জায়গা নিরাময় করে।

খুশীর ঘরের অপ্রতুলতার বর্ণনা প্রসঙ্গে খইয়ের মোয়া এই লোকখাদ্যটি উল্লিখিত হয়েছে। বলা হযেছে, সারা বছর খাইয়া বিলাইয়া হাঁড়ি খইয়ের মোয়া রাখিয়াও সে ধান কমে না, এমনি অজস্র।' অনন্তের মার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এক রমণী কলার খোল কাটতে একটি 'দা' চেয়েছে, 'দা' একটি লোকযন্ত্র।

সুবলার বউ অন্তরবালাকে সুতা কার নানা হাতিয়ার দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে ছিল বড় টাকু, মোটা সুতোর লগি, ছোট টাকু, পিঁড়ি ইত্যাদি।

ঢোল, সানাই, সারিন্দা এই লোকবাদ্যগুলো উল্লিখিত হয়েছে। উল্লিখিত হয়েছে সুবলের গোপীযন্ত্র বাজাবার কথা। শীতের পেশাক গাতি; নিত্যানন্দের গা থেকে তার ভাই গৌরাঙ্গ সুন্দর গাতি খুলে দিয়েছে। এ পোশাকের বৈশিষ্ট হলো পরতে পরতে পেঁচানো কাপড়ের নিবিড় বন্ধন, পিঠে থাকে বড় গেরো।

বাসুদেবপুরের সঙ্গে শুকদেবপুরের মালোদের সংঘর্ষে, শুকদেবপুরের মালোরা মুন্সি বাঁশের কাঁদি, এককেটে কোচ, চল প্রভৃতি লোক অস্ত্রাদি প্রস্তুত রেখেছি। কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লাঙল, জোয়াল, কাঁচি, নিড়ানি, মই উল্লিখিত হয়েছে। সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যাত হয় যে গল্পের মাধ্যমে তাই হল Myth বা লোকপুরাণ। হরধনুর প্রসঙ্গে লেখক একটি লোকপুরাণ উল্লেখ করেছেন স্বল্প পরিসরে। রামের হাতের ধনুক হলো আসলে হরধনু। এই ধনুকটি তুলতে নিয়ে দশমাথা কুড়ি হাতবিশিষ্ট রাবণের মুখে রক্ত ওঠে। যাইহোক রামচন্দ্র এই ধনুক অনায়াসে তুলে ধরেন। লেখক বর্ণনা করেছেন, 'সীতা সে ধনু রোজই বাঁ হাতে তুলিয়া লইয়া ডানহাতে তলাকার জায়গাটুকু লেপিয়া পুছিয়া শুদ্ধ করিয়া দিত। তারপর সীতার বিবাহ হইয়া গেল।'

শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে মালো পাড়ায় মেয়েরা এক অভিনব বিবাহের আয়োজন করে। এর নাম জালা বিয়া। কেননা, এই বিবাহের মুখ্য উপকরণই হলো ধানের চারা বা জালা। *'এক মেয়ে বরের মতো সোজা হইয়া চৌকিতে দাড়ায়, আরেক মেয়ে কনের মত সাতবার তাকে প্রদক্ষিণ করে। দীপদানির মতো একখানি পাত্রে ধানের চারাগুলি রাখিয়া বরের মুখের কাছে নিয়া প্রতিবার নিছিয়া পুচিয়া লয়। এই ভাবে জোড়ায় জোড়ায় নারীদের মধ্যে বিবাহ হইতে থাকে আর একদল নারী গীত গাহিয়া চলে।'*

রাধাচরণ মালো এক সাংঘাতিক স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে সে ভয় পেয়ে তিনবার রাম নাম স্মরণ করেছে এবং তাতেই তার ভয় গিয়েছে বলে জানিয়েছে। রাম নামর অলৌকিক ক্ষমতার লোকের বিশ্বাস অবিচল।

নানাবিধ লোক আভরণের উল্লেখ করা হয়েছে উপন্যাসটিতে। যেমন হাতের কঙ্কণ, গলার পাঁচ নারীর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়ছে। গোল্লাছুট খেলাটির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু খেলাটি কোনো বিবরণ লেখক দেননি। খেলাটি

ছেলেদের, এইটুকু তথ্যই প্রদত্ত হয়েছে। দুটি পক্ষ নিয়ে খেলা প্রতিটি দলে থাকে আটদশজন খেলোয়াড়। একটি বড় জায়গায় একটি বৃত্ত অঙ্কন করা হয়। এই বৃত্তের মাঝখানে একটি গর্ত করা হয়। গর্তে পোঁতা থাকে একটি লাঠি। এই বৃত্ত থেকে কুড়ি-বাইশ গজ দূরে একটি সীমানা থাকে। একদল খেলেয়াড় থাকে বৃত্তের মধ্যে একজন বৃত্তের মধ্যকার লাঠিটি ধরে থাকে, অন্যদিকে বৃত্তের অন্য খেলোয়াড়রা লাঠি হাতে ধরা খেলোয়াড়ের হাত ধরে বেষ্টনী রচনা করে নেয়। সকলে এবারে ঘুরতে শুরু করে বৃত্তের মধ্যে। এভাবে যে বেষ্টনীচ্যুত হয়, সে দৌড়ে বৃত্তের বাইরের নির্ধারিত সীমানাক স্পর্শ করবার চেষ্টা করে স্পর্শ করতে পারলেই তার জয় হয়। বিপক্ষের খেলোয়াড়রা প্রহরারত অবস্থায় থাকে বৃত্তের বাইরে। বৃত্তের বাইরে সীমানা স্পর্শ করার পূর্বেই ছুটন্ত খেলোয়াড়কে চুয়ে ফেলতে পারলেই সে মোড় হয়। কেউ কেউ মনে করেছেন 'প্রত্ন ঐতিহাসিক নগরসভ্যতার দাসশ্রম প্রথা' এই খেলায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

সুবলার বউয়ের মা সুবলার বউকে বলেছে, *'আ-লো নিশুত্তুরি তরনি এই দশা'* এখানে *'নিশুত্তুরি'* লোক ভৎর্সনার নিদর্শন। অনন্তের মাসী অনন্তকে অভিশাপ দিয়ে বলেছে সে যদি তাদের গৃহে ভাত খায় তবে *'সাত গুষ্টির মাথা খাস।'*

অদ্বৈত মল্লবর্মণ মন্তব্য করেছে, *'মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল।'* গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মাল মসলায় সে সংস্কৃতির ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বণে, হাসি ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভেতরে প্রবেশ করা বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। কারণ মালোদের সাহিত্যে উপভোগ আর সকলের চাইতে স্বতন্ত্র। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত তাদের গানগুলো ভাবে যমন মধুর, সুরেও তেমনি অন্তরস্পর্শী। সে ভাবের, সে সুরের মর্ম গ্রহণ অপরের পক্ষে সুসাধ্য নয়। লেখক নিজে মালো সম্প্রদায়গুলোকে হওয়ার কারণে এই সংস্কৃতি অনুধাবন করেছিলেন যেমন অন্তর দিয়ে, তেমনি আমাদের তা অনুধাবনের সুযোগ করেও দিয়েছেন। সেই লেখক এই সংস্কৃতির বিলীয়মান অবস্থায় দুঃখবোধ করেছেন। বলেছেন, *'অধুনা মালোরা সে সব গান ভুলিয়া যাইতেছেন।'*

প্রাচীন ও অর্বাচীন সংস্কৃতির দ্বন্ধ লেখক দেখিয়েছেন- *'তাদের ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল।'* কী রকম, লেখকের জবানিতে *'তাদর ছেলেরা হুকা ছাড়িয়া সিগারেট ধরিল। তারা আগের মতো গুরুজনদের মানিত না । বাপখুড়াদের প্রতি তাদর ভক্তি যেমন হ্রাস পাইল, তেমনি সহানুভূতও কমিয়া গেল।'*

মালোরা জানিয়েছিল তারা যাত্রা গাইবে না, কেননা এ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নয়,- "*ময়-মুরব্বিরা কি আমাদের জন্য গান কিছু কম রাখিয়া গিয়াছে। সেসব গানের কাছে যাত্রা গান তো বাঁদী।*" কালোবরণের বাড়িতে যাত্রা পালার দর্শকেরা ভাটিয়ালির আকর্ষণে মোহনের বাড়ি চলে এলেও, নিজেদের প্রাণের গান আস্বাদন করেও শেষে যখন কালোবরণের বাড়িতে বাক্স বাক্স সাজ আসিল এবং রাত্রিতে যখন সাজ পোশাক পড়িয়া সত্যিকারের যাত্রা আরম্ভ হইল, মালোরা তখন সব ভুলিয়া যাত্রার আসর ভরিয়া তুলিল। সুবলার বউ আর মোহন রয় গেল কেবল নিজেদের সংস্কৃতিকে আকড়ে ধরে। বলাবাহুল্য লেখকও এদেরই পক্ষে, তবুও যা অনিবার্য তাকে তিনি পথ ছেড়ে দিয়েছেন সম্মান ও বেদনাবোধের সঙ্গে।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে আমরা বেশ কয়েকটি অপ্রধান ও হঠাৎ উপস্থিত (খণ্ডিত) চরিত্রের পরিচয় পায়। এই চরিত্রসমূহে বিকাশ ও পূর্ণ সহায়তায় কাহিনি ও প্রধান চরিত্রের প্রকাশে সহায়ক হয়েছে। তারা হলো- বনমালী, রামকেশর, সুবল, তিলকচাঁদ, বাঁশিরাম মোড়ল, উদয়তারা, কালোর মা, বাসন্তীর মা, বন্দে আলী, দীননাথ, গৌরাঙ্গ, গগন, নিত্যানন্দ, করমালী, রামপ্রসাদ, কাদির, জমিলা, কিশোরের মা, বাঁশিরামের মা, অনন্তবালা, শরীয়তুল্লাহ, নয়নতারা, আসমানতারা, সাধু বাবাজি প্রমুখ। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসও বলা যায়। কারণ এতে বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও বৈশিষ্ট্যের বাস্তবতা, ভাষা ও সংস্কৃতির তীব্র জীবনবোধ চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। ফলে উপন্যাসটিকে প্রাকৃতজনের জীবনচিত্র বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন-

> *"এ উপন্যাসের ভাষাতেও আছে একই সঙ্গে স্থানিকতা ও প্রবহমানতার সুর। অসীম নৈপুণ্যে লেখক ধারণ করেছেন, কিংবা বলি প্রকাশ করেছেন, আঞ্চলিকতার চারিত্র এবং সীমাহীতার বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসের ভাষায় এসেছে কখনো জীবনের জন্য গভীর আকষর্ণের সুর, কখনো বা উদাসীনতার গৈরিক রঙ। সামাজিক গতিশীলতার অভাবই তিতাসকে করে রখে আঞ্চলিক। আবার অন্তর্গত প্রবহমানতার সূত্র সেখানে সৃষ্টি করে ভূগোল-ছেঁড়া সর্বকালীন আবেদন। ঈর্ষণীয় নৈপুণ্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণ এই দুই বিপ্রতীপ অথচ গভীরতর অর্থে সমার্থক চেতনাকে শব্দ ও রেখায় ধারণ করেছেন। (অদ্বৈত মল্লবর্মণ, তিতাস একটি নদীর নাম, ঢাকা, আজকাল সংস্করণ ২০০৮,*

আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪, বাংলাবাজার-১১০০, ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের ভূমিকাংশ, পৃ:২২)"

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' জীবনাভাজ্ঞিতার ফসল। এই উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা ও লেখকের। যা আমাদের চেতনার সার্বিক উপলব্ধিকে সার্থক করেছে, করেছে সুন্দর। তিতাস তীরবর্তী মানুষের জীবনের যে দোলাচল- তাও আবার একটি গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে, অদ্বৈত মল্লবর্মণ চিত্রকর ও শিল্পী মানসিকতার প্রাণ পুরুষ বলেই বিষয়টিকে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন এবং আমাদের বোধকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছেন। তার সংলাপ নির্মাণ অতি প্রশংসার দাবি রাখে। সবকিছু মিলিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটিকে শিল্পোত্তীর্ণ করেছেন।

> *"সমকালীন বাস্তবতাকে প্রাকৃত ও লৌকিক জীবনের মধ্যে ধারণ করতে গিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণকে আঙ্গিক নিয়ে তেমন দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। আপন অভিজ্ঞতার আলোকে তিতাসের স্রোতের মতো তিনি নির্মাণ করেছেন তাঁর প্রতিবেদন- স্রোত, বহমানতাই যার প্রধান চারিত্র্যলক্ষণ। প্রাকৃতজনের প্রাত্যহিত জীবনায়নে এই বহমানতার সূত্র আছে এ উপন্যাসের বর্ণনা রীতিতে। (ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের ভূমিকাংশ, পূর্বোক্ত, পৃ:২২)"*

উপন্যাসটিকে আরো প্রাণোজ্জ্বল করে তুলেছে লোকজ শব্দের ব্যবহার এবং বর্ণনা কৌশল যা উপন্যাসের প্রাণ। তাই বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস সাহিত্যে 'তিতাস একটি নদীর নাম' অভিনব ও কালজয়ী সংযোজন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র (সম্পাদক: অচিন্ত্য বিশ্বাস), কলকাতা ২০০০, দে'জ পাবলিশিং)

২. গিয়াস শামীম, বাংলাদেশ আঞ্চলিক উপন্যাস (ঢাকা: ২০০০, বাংলা একাডেমি)

৩. বরুন কুমার চক্রবর্তী, লোকসংস্কৃতির সাতকাহন (ঢাকা: ২০০৯, বিশ্ব সাহিত্য ভবন)

৪. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি)
৫. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, তিতাস একটি নদীর নাম, ঢাকা, আজকাল সংস্করণ ২০০৮, আজকাল প্রকাশনী, ৩৮/৪, বাংলাবাজার-১১০০, (ভূমিকা- ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ)।
৬. শারমিন আক্তার, অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাস: নগরজীবন ও রাজনীতি চেতনা (প্রবন্ধ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা-সাহিত্যপত্র, (সম্পাদক- অধ্যাপক ড. অনিরুদ্ধ কাহালি) বাংলা বিভাগ, ৩৯ বার্ষিক সংখ্যা- ২০১৩)

ড. শামস্ আল্‌দীন
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়।

প্র থ ম অ ধ্যা য়

তিতাস একটি নদীর নাম

তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস।

স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়।

ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়; রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না।

মেঘনা-পদ্মার বিরাট বিভীষিকা তার মধ্যে নাই। আবার রমু মোড়লের মরাই, যদু পণ্ডিতের পাঠশালার পাশ দিয়া বহিয়া যাওয়া শীর্ণা পল্লীতটিনীর চোরা কাঙ্গালপনাও তার নাই। তিতাস মাঝারি নদী। দুষ্ট পল্লীবালক তাকে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে না। আবার ছোট নৌকায় ছোট বউ নিয়া মাঝি কোনদিন ওপারে যাইতে ভয় পায় না।

তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মত বক্রতা নাই, কৃপণের মতো কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাঁটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়, কিন্তু কাঙ্গাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না।

কত নদীর তীরে একদা নীল-ব্যাপারীদের কুঠি-কেল্লা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কত নদীর তীরে মোগল-পাঠানের তাঁবু পড়িয়াছে, মগদের ছিপনৌকা রক্ত-লড়াইয়ে মাতিয়াছে–উহাদের তীরে তীরে কত যুদ্ধ হইয়াছে। মানুষের রক্তে হাতিঘোড়ার রক্তে সে-সব নদীর জল কত লাল হইয়াছে। আজ হয়ত তারা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু পুঁথির পাতায় রেখ্ কাটিয়া রাখিয়াছে। তিতাসের বুকে তেমন কোন ইতিহাস নাই। সে শুধু একটা নদী।

তার তীরে বড় বড় নগরী বসানো নাই। সওদাগরের নৌকারা পাল তুলিয়া তার বুকে বিচরণ করিতে আসে না। ভূগোলের পাতায় তার নাম নাই।

ঝরণা থেকে জল টানিয়া, পাহাড়ি ফুলেদের ছুঁইয়া ছুঁইয়া উপল ভাঙিয়া

নামিয়া আসার আনন্দ কোনকালে সে পায় নাই। অসীম সাগরের বিরাট চুম্বনে আবিলয়ের আনন্দও কোনকালে তার ঘটিবে না। দুরন্ত মেঘনা নাচিতে নাচিতে কোন্‌কালে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে পা ফসকাইয়াছিল; বাঁ তীরটা একটু মচ্‌কাইয়া গিয়া ভাঙিয়া যায়। স্রোত আর ঢেউ সেখানে প্রবাহের সৃষ্টি করে। ধারা সেখানে নরম মাটি খুঁজিয়া, কাটিয়া, ভাঙিয়া, দুমড়াইয়া পথ সৃষ্টি করিতে থাকে। এক পাকে শত শত পল্লী দুই পাশে রাখিয়া অনেক জঙ্গল অনেক মাঠ-ময়দানের ছোঁয়া লইয়া ঘুরিয়া আসে—মেঘনার গৌরব আবার মেঘনার কোলেই বিলীন হইয়া যায়। এই তার ইতিহাস। কিন্তু সে কি আজকের কথা? কেউ মনেও করে না কিসে তার উৎপত্তি হইল। শুধু জানে সে একটি নদী। অনেক দূর-পাল্লার পথ বাহিয়া ইহার দুই মুখ মেঘনায় মিশিয়াছে। পল্লী রমণীর কাঁকনের দুই মুখের মধ্যে যেমন একটু ফাঁক থাকে, তিতাসের দুই মুখের মধ্যে রহিয়াছে তেমনি একটুখানি ফাঁক—কিন্তু কাঁকনের মতই তার বলায়াকৃতি।

অনেক নদী আছে বর্ষার অকুণ্ঠ প্লাবনে ডুবিয়া তারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পারের কোনো হদিস থাকে না, সবদিক একাকার। কেউ তখন বলিতে পারে না এখানে একটা নদী ছিল। সুদিনে আবার তাদের উপর বাঁশের সাঁকোর বাঁধ পড়ে। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়িরা পর্যন্ত একখানা বাঁশে হাত রাখিয়া আর একখানা বাঁশে পা টিপিয়া টিপিয়া পার হইয়া যায়। ছেলে-কোলে নারীরাও যাইতে পারে। নৌকা-গুলি অচল হয়। মাঝিরা কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সেগুলিকে টানিয়া নেয়। এপারে ওপারে ক্ষেত। চাষীরা দিনের রোদে তাতিয়া কাজ করে এপারের চাষী ওপারের জনকে ডাকিয়া ঘরের খবর জিজ্ঞাসা করে। ওপারের চাষী ঘাম মুছিয়া জবাব দেয়। গরুগুলি নামিয়া স্নান করিতে চেষ্টা করে। অবগাহনস্নান। কিন্তু গা ডোবে না। কাকস্নান করা মাত্র সম্ভব হয় কোন রকমে। নারীরা কোমরজলে গা ডুবাইবার চেষ্টায় উবু হইয়া দুই হাতে ঢেউ তুলিয়া নীচু-করা ঘাড়ে-পিঠে জল দিয়া স্নানের কাজ শেষ করে। শিশুদের ডুবিবার ভয় নাই বলিয়া মায়েরা তাদের জলে ছাড়িয়া দিয়াও নিরুদ্বেগে বাসন মাজে, কাপড় কাচে, আর এক পয়সা দামের কার্বলিক সাবানে পা ঘষে। অল্প দূরে ঘর। পুরুষ মানুষে ডাক দিলে এখান হইতে শোনা যাইবে; তাই ব্যস্ততা নাই।

কিন্তু সত্যি কি ব্যস্ততা নাই? যে-মানুষটা এক-গা ঘাম লইয়া ক্ষেতে কাজ করিয়া বাড়ি গেল, তার ভাত বাড়িয়া দিবার লোকের মনে ব্যস্ততা থাকিবেইত। দুপুরে নারীরা ঘাটে বেশী দেরি করে না। কিন্তু সকালে সন্ধ্যায় দেরি করে। পুরুষেরা এজন্য কিছু বলে না। তারা জানে এ নদী দিয়া কোনো সদাগরের নৌকার আসা-যাওয়া নাই।

শীতে বড় কষ্ট। গম্ গম্ করিয়া জলে নামিতে পারে না। জল খুব কম। সারা গা তো ডোবেই না; কোমর অবধিও ডোবে না। শীতের কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে হুম্ করিয়া ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিবার উপায় নাই; একটু একটু করিয়া শরীর ভিজে। মনে হয় একটু একটু করিয়া শরীরের মাংসের ভিতর ছুরি চালাইতেছে কেউ। চৈত্রের শেষে খরায় খাঁ খাঁ করে। এতদিন যে জলটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও একটু একটু করিয়া শুষিতে শুষিতে একদিন নিঃশেষ হইয়া যায়। ঘামের গা ধুইবার আর উপায় থাকে না। গরুরা জল খাইতে ভুল করিয়া আসিয়া ভাবনায় কাতর হয়। মাঘের মাঝামাঝি সরষে ফুলে আর কড়াই-মটরের সবুজিমায় দুই পারে নক্‌সা করা ছিল। নদীতেও ছিল একটু জল। জেলেরা তিন-কোণা ঠেলা জাল ঠেলিয়া চাঁদা পুঁটি টেংরা কিছু-কিছু পাইত। কিন্তু চৈত্রের খরায় এ সবের কিছুই থাকে না। মনে হয় মাঘ মাসটা ছিল একটা স্বপ্ন। চারিদিক ধু-ধু করা রুক্ষতায় কাতরায়। লোকে বিচলিত হয় না। জানে তারা, এ সময় এমন হয়।

তিতাসের তেরো মাইল দূরে এমনি একটা নদী আছে। নাম বিজয় নদী। তিতাসের পারের জেলেদের অনেক কুটুম বিজয় নদীর পারের পাড়াগুলিতে আছে। তিতাসের পারের ওরা ওই নদীর পারের কুটুম-বাড়িতে অনেকবার বেড়াইতে গিয়াছে। বিয়ের কনের খোঁজে গিয়াছে। সে সব গাঁয়ে তারা দেখিয়াছে, চৈত্রের খরায় নদী কত নিষ্করুণ হয়। একদিক দিয়া জল শুকায় আর একদিক দিয়া মাছেরা দমবন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় নাক জাগাইয়া হাঁপায়। মাছেদের মত জেলেদেরও তখন দম বন্ধ হইতে থাকে। সামনে মহাকালের শুষ্ক এক কঙ্কালের ছায়া দেখিয়া তারা এক সময় হতাশ হইয়া পড়ে। যারা বর্ষার সময় চাঁদপুরের বড় গাঙ্ এ নৌকা লইয়া প্রবাস বাহিতে গিয়াছিল, তারা সেখানে নিকারীর জিম্মায় নাও জাল রাখিয়া রেলে চড়িয়া আসিয়া পড়ে। তাদের কোন চিন্তা থাকে না। হাতের টাকা ভাঙিয়া এই দুর্দিন পার করে। কিন্তু যারা বর্ষায় ঘরের মায়া ছাড়িয়া বাহির হয় নাই তারাই পড়ে বিপদে। নদী ঠন্‌ঠনে। জাল ফেলিবে কোথায়। তিন-কোণা ঠেলা-জাল কাঁধে ফেলিয়া আর-এক কাঁধে গলা-চিপা ডোলা বাঁধিয়া এ-পাড়া সে-পাড়ায় টই-টই করিয়া ঘুরিতে থাকে, কোথায় পানা পুকুর আছে, মালিকহীন ছাড়া-বাড়িতে। চার পাড়ে বন বাদাড়ের ঝুপড়ি। তারই ঝরাপাতা পড়িয়া, পচিয়া, ভারি হইয়া তলায় শায়িত আছে। তারই উপর দিয়া ভাসিয়া উঠিয়া ছোট মাছেরা ফুট দেয়। গলা-জল শুকাইয়া কোমর-জল, কোমর-জল শুকাইয়া হাঁটু-জল হইয়াছে। মাছেদের ভাবনার অন্ত নাই। কিন্তু অধিক ভাবিতে হয় না। গোপাল কাছা-দেওয়া দীর্ঘাকার মালো কাঁধের জাল নামাইয়া শ্যেন-দৃষ্টিতে তাকাইতে তাকাইতে এক সময় খেউ দিয়া

তুলিয়া ফেলে। মাছেদের ভাবনা এখানেই শেষ হয়, কিন্তু মাছ যারা ধরিল তাদের ভাবনার আর শেষ হয় না। তাদের ভাবনা আরও সুদুর-প্রসারী। সামনের বর্ষাকাল পর্যন্ত।

বর্ষাকালের আর খুব বেশি দেরি নাই। সঙ্কট অবসানের সম্ভাবনায় অনেক মালো উদ্বেগের পাহাড় ঠেলিয়া চলিয়াছে, হাতে ঠেলা-জাল লইয়া চুনো পুঁটি যা পায় ধরিয়া পোয়া দেড়-পোয়া চাউলের যোগাড় করিতেছে। কিন্তু গৌরাঙ্গ মালোর দিন আর চলিতে চায় না। একদিন অনেক খানাডোবায় খেউ দিয়া কিছুই পাইল না, নামিলে টগবগ করিয়া পচা জলের ভুরভুরি উঠে, আর খেউ দিলে তিনচারিটা ব্যাঙ্ জাল হইতে লাফাইয়া এদিকে ওদিকে পড়িয়া যায়।

উঠানের একদিকে একটা ডালিম গাছ। পাতা শুকাইয়া গিয়াছে। গৌরাঙ্গ সুন্দরের বউ লাগাইয়াছিল। বউ যৌবন থাকিতেই শুকাইয়া গিয়াছিল। গাল বসিয়া, বুক দড়ির মত সরু হইয়া গিয়াছিল। বুকের স্তনদুটি বুকেই বসিয়া গিয়াছিল তার। তারপর একদিন সে মরিয়া গিয়াছিল। সে মরিয়া গিয়া গৌরাঙ্গকে বাঁচাইয়াছে। তার কথা গৌরাঙ্গ সুন্দরের আর মনে পড়ে না। তারই মত শুকাইয়া-যাওয়া তারই হাতের ডালিম গাছটা চোখে পড়িতে আজ মনে পড়িয়া গেল। উঃ, বউটা মরিয়া কি ভালই না করিয়াছে! থাকিলে, আজ তার অবস্থা হইত ঠিক নিত্যানন্দ দাদার মত।

নিত্যানন্দ থাকে উত্তরের ঘরে। তার বউ আছে। আর আছে একটি ছেলে, একটি মেয়ে। নিত্যানন্দ-পরিবারের দিকে চাহিয়া গৌরাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! এক পেটের ভাবনা নিয়াই বাঁচি না, দাদা চারিটা পেটের ভাবনা মাথায় করিয়া কেমন তামাক খাইতেছে। তার যেন কোন ভাবনাই নাই।

সত্যি নিত্যানন্দর আর কোন ভাবনা নাই। যতই ভাবিয়াছে, দেখিয়াছে কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। বউ ঝিমাইতেছে। ছেলেমেয়ে দুইটা নেতাইয়া পড়িয়া কিসের নির্ভরতায় অক্ষম নিত্যানন্দর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। আর নিত্যানন্দ কোন উপায় না দেখিয়া কেবল তামাক টানিতেছে।

পশ্চিমের ভিটায় গৌরাঙ্গ সুন্দরের ঘর। ডালিম গাছে কাঁধের জাল ঠেকাইয়া দিয়া ডোলাটা ছুঁড়িয়া ফেলিল দাওয়ার একদিকে। দক্ষিণ ও পূর্বদিকের ভিটা খালি। তাদের দুই কাকা থাকিত। এক কাকা মরিয়া গিয়াছে এবং তার ঘর বেচিয়া তার শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছে। আরেক কাকা ঘর ভাঙিয়া লইয়া আরেক গাঁয়ে চলিয়া গিয়াছে।

গৌরাঙ্গ অকারণে খেঁকাইয়া উঠিল, 'খালি তামুক খাইলে পেট ভর্‌ব?'

'কি খামু তবে?'

না, লোকটার কেবল পেটই শুকায় নাই। মাথাও শুকাইয়া গিয়াছে।

'চল যাই বুধাইর বাড়ি।'

নয়ানপুরে বোধাই মালো টাকায় সব মালোদের চেয়ে বড়। বাড়িতে চার পাঁচটা ঢেউটিনের ঘর। দুই ছেলে রোজগারী লোক। বোধাই হাতীর মত মোটা ও কাল। শরীরে হাতীর মত জোর। তার কারবার অন্য ধরনের। বড় বড় দীঘি ইজারা নিয়া মাছের পোনা ফেলে। মাছ বাড়িতে থাকে, আর তারা তিন বাপ বেটায় লোকজন লইয়া জাল ফেলে, মাছ তোলে, মাছ চালান দেয়। এ কাজে বোধাই অনেক লোকজন খাটায়। নদীতে জল না থাকিলে, মালোরা যখন দুই চোখে অন্ধকার দেখে তখন তারা যায় বোধাইর বাড়িতে।

কিন্তু তিতাসে কত জল! কত স্রোত! কত নৌকা! সব দিক দিয়াই সে অকৃপণ।

আর বিজয়-নদীর তীরে-তীরে যে-মালোরা ঘর বাঁধিয়া আছে, তাদের কত কষ্ট। নদী শুকাইয়া গেলে তাদের নৌকাগুলি অচল হইয়া থাকে আর কাঠ-ফাটা রোদে কেবল ফাটে।

তিতাস-তীরের মালোরা যারা সেখানে বেড়াইতে গিয়াছে, চৈত্রের করায় নদী কত নিষ্করুণ হয় দেখিয়া আসিয়াছে। রিক্ত মাঠের বুকে ঘূর্ণির বুভুক্ষা দেখিতে দেখিতে ফিরতি-পথে তারা অনেকবার ভাবিয়াছে, তিতাস যদি কোনদিন এই রকম করিয়া শুকাইয়া যায়! ভাবিয়াছে, এর আগেই হয়ত তাদের বুক শুকাইয়া যাইবে। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ পাশের জনকে নিতান্ত খাপছাড়াভাবে বলিয়াছে : 'বিজ্‌নার পারের মালোগুস্টি বড় অভাগা রে ভাই, বড় অভাগা!'

যারা বিজয় নদীর দশা দেখে নাই, বছরের পর বছর কেবল তিতাসের তীরেই বাস করিয়াছে, তারা এমন করিয়া ভাবে না। তারা ভাবে তিন-কোণা ঠেলা-জাল আবার একটা জাল। তারে হাঁটু জলে ঠেলিতে হয়, ওঠে চিংড়ির বাচ্চা। হাত তিনেক তো মোটে লম্বা। বিজয়ের বুকে তা-ই ডোবে না। তিতাসের জলে কত বড় বড় জাল ফেলিয়া তারা কত রকমের মাছ ধরে। এখানে যদি তিতাস নদী না থাকিত, বিজয় নদী থাকিত, তবে নাকের চারিদিক থেকে বায়ুটুকু সরাইয়া রাখিলে যা অবস্থা হয়, তাদের ঠিক সেই রকম অবস্থা হইত। ওদের মতো ঠেলা-জাল ঘাড়ে করিয়া গ্রামগ্রামান্তরের কানা-ডোবা খুঁজিয়া মরিতে হইত দুই আনা আর দশ পয়সার মোরলা ধরিবার জন্য।

জেলেদের বৌ-ঝিরা ভাবে অন্যরকম কথা—বড় নদীর কথা যারা শুনিয়াছে। যে-সব নদীর নাম মেঘনা আর পদ্মা। কি ভীষণ! পাড় ভাঙে। নৌকা ডোবায়। কি ঢেউ। কি গহীন জল। চোখে না দেখিয়াই বুক কাঁপে! কত কুমীর আছে সে-সব নদীতে। তাদের পুরুষদের মাছ ধরার জীবন। রাতে-বেরাতে তারা জলের

উপরে থাকে। এতবড় নদীতে তারা বাহির হইত কি করিয়া! তাদের নদীতে পাঠাইয়া মেয়েরা ঘরে থাকিতই বা কেমন করিয়া! তিতাস কত শান্ত। তিতাসের বুকে ঝড়-তুফানের রাতেও স্বামী-পুত্রদের পাঠাইয়া ভয় করে না। বৌরা মনে করে স্বামীরা তাদের বাহুর বাঁধনেই আছে, মায়েরা ভাবে ছেলেরা ঠিক মায়েরই বুকে মাথা এলাইয়া দিয়া শান্তমনে মাছ-ভরা জাল গুটাইতেছে।

বাংলার বুকে জটার মতো নদীর প্যাঁচ। সাদা, ঢেউ-তোলা জটা। কোন্ মহাস্থবিরের চুম্বন-রস-সিক্ত বাংলা। তার জটাগুলি তার বুকের তারুণ্যের উপর দিয়া সাপ-খেলানো জটিলতা জাগাইয়া নিরাঙ্গের দিকে সরিয়া পড়িয়াছে। এ সবই নদী।

সবগুলি নদীর রূপ এক নয়। উহাদের ব্যবহার এবং উহাদের সহিত ব্যবহার তাও বিভিন্ন রকমের। সবগুলি নদীই মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কাজে আসে। কিন্তু এ কাজে আসার নানা ব্যতিক্রম আছে। বড় নদীতে সওদাগরের নৌকা আসে পাল উড়াইয়া। উহার বিশাল বুকে জেলেরা সারাদিন নৌকা লইয়া ভাসিয়া থাকে। নৌকায় রাঁধে, খায়, ঘুমাইয়া থাকে। মাছ ধরে। সব বিষয়ে একটা কঠোর রূপ এখানে প্রকটিত। তীরে তীরে বালুচর, তাল নারিকেল সুপারির বাগ। স্রোতের খরায় তীরের মাঠি কাটে, ধ্বসে। ঢেউয়ের আঘাতে তীরগুলি ভাঙিয়া খসিয়া পড়ে। গৃহস্থালি ভাঙে। খেত-খামার ভাঙে, তাল-নারিকেল, সুপারির গাছগুলি সারি বাঁধিয়া ভাঙিয়া পড়ে। ক্ষমা নাই। ভাঙ্গাগড়ার এক রুদ্র দোলার দোলনায়—করাল এক চিত্তচঞ্চল ক্ষিপ্ত আনন্দ....সে-ই এক ধরনের শিল্প।

শিল্পের আরেকটা দিক আছে। সৌম্য শান্ত করুণ স্নিগ্ধ প্রসাদ-গুণের মাধুর্যে রঞ্জিত এ শিল্প। এ শিল্পের শিল্পী মহাকালের তাণ্ডবনৃত্য আঁকিতে পারে না। পিঙ্গল জটার বাঁধন খসিয়া পড়ার প্রচণ্ডতা এ শিল্পীর তুলিকায় ধরা দিবে না। এ শিল্পের শিল্পী মেঘনা, পদ্মা, ধলেশ্বরীর তীর ছাড়িয়া তিতাসের তীরে আঙিনা রচনা করিয়াছে।

এ-শিল্পী যে-ছবি আঁকে তা বড় মনোরম। তীর-ঘেঁষিয়া সব ছোট ছোট পল্লী। তারপর জমি। তাতে অঘ্রাণ মাসে পাকা ধানের মৌসুম। মাঘ মাসে সর্ষেফুলের অজস্র হাসি। তারপর পল্লী। ঘাটের পর ঘাট। সে ঘাটে জীবন্ত ছবি। মা তার নাদুস-নুদুস ছেলেকে ডুবাইয়া চুবাইয়া তোলে। বৌ-ঝিরা সব কলসী লইয়া ডুব দেয়। পরক্ষণে ভাসিয়া উঠে। অল্প দূর দিয়া নৌকা যায়, একের পর এক। কোনটাতে ছই থাকে, কোনোটাতে থাকে না। কোনো কোনো সময় ছইয়ের ভিতর নয়া বউ থাকে। বাপের বাড়ি থেকে স্বামী তার বাড়িতে লইয়া যায়; তখন ছইয়ের এ-পারে ও-পারে থাকে বউয়েরই শাড়ি-কাপড়ের